Islami Ain O Bichar
Vol. 17, Issue: 68
Oct.-Dec. 2021

ইসলামী আইনে তা'যীর
Ta'zīr in Islamic Law

Gulshan Akter*
Dr. Muhammad Mahbubur Rahman**

ABSTRACT

Islam has promulgated logical rulings and regulations for the welfare of humanity. But when anyone violates this beneficial laws, punishmnet has been determined for his so violation. However there are some certain offences for which punishment has been determined by Sharī'ah, while for others, punishment has not been defined, and such punishment is called ta'zīr or general punishment. This article has been written to define ta'zīr, its authenticity, classification, logicality and philosophy as it plays an important role in decreasing the criminal tendency of the society. The article has been written in line with the descriptive and analytical methods. The books of fiqh alongside the Quran-Sunnah have been analyzed and the real experineces as found in the context of the present society have been applied. It has been proved from the research that from among the Islamic penal laws ta'zīr is an important crime deterrent ruling. The province of ta'zīr punishment is vast and like ḥadd and qiṣāṣ it is not related to certain punishments. In this regard, judge may award the convicted any sort of punishmnet as time space and context require. It however must be proportionate to the degree of the offence. And the aim of this punishment would be to ensure collective wellness, establish truth and fair judgment and justice, and deter all sorts of injustce and social enchrochment.

Keywords: Islamic Law; T*a'zīr*; Crime; *Ḥudūd*; *Qiṣāṣ*.

সারসংক্ষেপ

ইসলাম মানবতার কল্যাণে যৌক্তিক বিধিবিধান প্রণয়ন করেছে। কিন্তু কেউ যখন এ কল্যাণকর বিধান অমান্য করে তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। অবশ্য কতিপয় অপরাধের শাস্তি সুনির্দিষ্ট হলেও এমন কিছু অপরাধ আছে যেগুলোর শাস্তি ইসলামী আইনে নির্দিষ্ট করা হয়নি। আর এ ধরনের শাস্তিকে তা'যীর বা সাধারণ শাস্তি বলা হয়। সমাজের অপরাধ প্রবণতা হ্রাসকল্পে তা'যীরী শাস্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বিধায় এর পরিচিতি, প্রামাণিকতা, প্রকারভেদ, যৌক্তিকতা ও দর্শন আলোচনার উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধটি প্রণীত হয়েছে। বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক গবেষণা পদ্ধতিতে প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে এবং কুরআন-হাদীসের পাশাপাশি ফিক্‌হের গ্রন্থগুলো পর্যালোচনা এবং বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে বাস্তব অভিজ্ঞতাসমূহের প্রয়োগ করা হয়েছে। গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, ইসলামী শাস্তি বিধানের মধ্যে তা'যীর তথা সাধারণ শাস্তি একটি অন্যতম অপরাধ প্রতিরোধক বিধান। তা'যীর পর্যায়ের শাস্তিসমূহের ক্ষেত্র বিশাল। এটি হদ্দ বা কিসাসের ন্যায় নির্দিষ্ট কোন একক শাস্তির সাথে সম্পৃক্ত নয়। এক্ষেত্রে বিচারক আসামীকে স্থান, কাল, পাত্র ও প্রেক্ষাপট ভেদে যে কোন ধরনের শাস্তি দিতে পারেন। অবশ্য তা কৃত অপরাধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। আর এ শাস্তির উদ্দেশ্যই হবে সামষ্টিক কল্যাণ, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা, সুবিচার ও ন্যায় কায়েম করা এবং সর্বপ্রকার যুল্‌ম ও সামাজিক অনাচার প্রতিহত করা।

মূলশব্দ: ইসলামী আইন, তাযীর, অপরাধ, হুদুদ, কিসাস।

* Gulshan Akter is an M.A student (thesis group), Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, email: aktergulshan927@gmail.com
** Dr. Muhammad Mahbubur Rahman is a Professor & Chairman, Department of Islamic Studies, University of Rajshahi, email: mahbub.ru2011@gmail.com

ভূমিকা

ইসলাম মানবজাতির জন্য এক শ্রেষ্ঠ গাইডলাইন বা পথনির্দেশনা। এ পথনির্দেশনায় সমাজ থেকে অপরাধ দূরীকরণের জন্য বৈষয়িক বা পারলৌকিক শাস্তির বিধানই শুধু বর্ণিত হয়নি; বরং মানবসমাজকে অপরাধমুক্ত করার জন্য দণ্ডবিধি কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইসলামের এ দণ্ডবিধি অপরাধ প্রতিরোধক। আল্লাহ্ এ দণ্ডবিধি প্রবর্তন করেছেন তাঁর আরোপিত বিধিনিষেধ লঙ্ঘন থেকে মানুষকে বিরত রাখার মহান লক্ষ্যে। এজন্য আল-কুরআনে কিছু কিছু অপরাধের হদ্দ বা সুনির্দিষ্ট শাস্তি ঘোষিত হয়েছে। যেমন- ব্যভিচার, ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি। আবার কিছু কিছু অপরাধের কিসাস গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন- হত্যা, অঙ্গহানি ইত্যাদি। আর যে সমস্ত অপরাধের শাস্তি কুরআন ও সুন্নাহয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি কিন্তু ইজতিহাদের মাধ্যমে অপরাধ প্রতিরোধের জন্য বিচারক যে শাস্তি নির্ধারণ করে থাকেন তাকেই তা'যীর বা সাধারণ শাস্তি বলা হয়। অপরাধ দমনে এ ধরনের শাস্তির কার্যকর প্রভাব রয়েছে। কতিপয় নির্দিষ্ট অপরাধের বিচার ও শাস্তি ছাড়া অধিকাংশ অপরাধের বিচার ও শাস্তি তা'যীরের (সাধারণ শাস্তি) মাধ্যমে ফয়সালা করা হয়। তাই ইসলামী সমাজে তা'যীর বা সাধারণ শাস্তির পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয়। এজন্য বিষয়টি যত প্রচারিত ও বিশ্লেষিত হবে, মুসলিম সমাজ অপরাধ নিরসনে তত উপকৃত হবে। বাংলা ভাষায় এ সম্পর্কে কিছু প্রবন্ধ ও রচনা প্রকাশিত হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় যৎকিঞ্চিত বলে মনে হয়। এজন্য বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে অত্র প্রবন্ধে ইসলামী আইনে তা'যীর : যৌক্তিকতা ও দর্শন সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

তা'যীরের পরিচয়

তা'যীর শব্দটি উযরু (عزر) শব্দমূল থেকে উদ্ভূত (Al-Jazīrī, 2005, 29; Ibn Humām ND, 344; Ibn Nujaym ND, 40; Hughes, 1976, 632; Galwash, 1963, p.104)। আভিধানিক অর্থ ফিরিয়ে দেয়া, নিষেধ করা, নিবৃত করা, তিরস্কার করা, শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া, সংস্কার করা, উপদেশ দেয়া, সংশোধন করা, শৃঙ্খলা বিধান করা, সাহায্য-সহযোগিতা করা ইত্যাদি (Misbah, 1999, 425, Al-Balyāwī, 1982, 549)। যেমন বলা হয়- عزر فُلَان أخاه "সে তার ভাইকে সাহায্য করেছে।" এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ "তাকে সাহায্য করো এবং তার প্রতি সম্মান ও মর্যাদা দেখাও (Al-Qurān, 48: 9)।" অনুরূপভাবে তা'যীর শব্দটি تَعْظِيْم 'সম্মান' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কেননা যখন কোন মানুষ শাস্তি ভোগের কারণে অপরাধ কর্ম থেকে বিরত থাকে, তখন সে নিজেকে সম্মানিত করে সমাজে মর্যাদাবান হয়ে যায় (Amīr 2006, 48)। এ ধরনের শাস্তিকে তা'যীর (تَعْزِيْرُ) বলা হয় এজন্য যে, শাস্তি অপরাধীকে অপরাধ কর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখে অথবা একবার অপরাধ করে শাস্তি ভোগের পর পুনরায় অপরাধ করার সাহস করে না।

ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্য এমন অপরাধের শাস্তি বিধান সুনিশ্চিত করাকে তা'যীর বলা হয়, যে অপরাধগুলোর শাস্তি শরী'আতে নির্দিষ্ট করা হয়নি ('Awdah ND, 685; Al-Māwardī 1427H, 344)। অর্থাৎ তা'যীর এমন অপরাধ যার জন্য হদ্দ ও কাফ্ফারা নির্ধারিত হয়নি এবং এটি এমন অপরাধের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয়, যে অপরাধ হদ্দকে সাব্যস্ত করে না (Ibn Qudāmah 1997, 342-343; Al-Mutlaq & Al-Arfaz, 1424H, 174; Fatawa and Masail, 2001)।

১. আল-মাউসু'আতুল ফিকহিয়্যাহতে বলা হয়েছে,

هُوَ عُقُوبَةٌ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ شَرْعًا، تَجِبُ حَقًّا لِلَّهِ، أَوْ لِآدَمِيٍّ، فِي كُل مَعْصِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ وَلاَ كَفَّارَةٌ غَالِبًا.

তা'যীর হলো শরয়ীভাবে অনির্ধারিত শাস্তি, যা আল্লাহ্‌র অধিকার বা মানুষের অধিকার হিসেবে আবশ্যক হয়, এমনসব অপরাধের ক্ষেত্রে যাতে সাধারণত কোনো হদ্দ বা কাফফারা নেই (Al-Mausū'ah 1427H, 12/254)।

২. সাইয়্যেদ আস-সাবিক (মৃ. ১৪২০ হি.) বলেন,

أَنَّهُ عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم على جناية أو معصية لم يعين الشرع لها عقوبة، أو حدد لها عقوبة ولكن لم تتوفر فيها شروط التنفيذ.

তা'যীর এমন একটি শিষ্টাচারমূলক শাস্তি, যা একজন শাসক কোন ফৌজদারী অপরাধ বা এমন কোন পাপাচারের জন্য দিয়ে থাকেন, যার জন্য শরী'আহ্ কোন শাস্তি নির্ধারণ করেনি অথবা শাস্তি নির্ধারণ করেছে কিন্তু ঐ শাস্তি কার্যকর করার শর্তাবলি পূরণ হয়নি (Al-Sābiq 1988, 598)।

৩. Muhammad Iqbal Siddiqi বলেন,

Ta'zir is defined as discretionary punishment to be inflicted for transgression against Allah, or against an individual, for which there is neither a fixed punishment nor a penance or expiation (Kaffara).

তা'যীরকে আল্লাহ এবং ব্যক্তির বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘনের কারণে অপরাধীদের শাস্তি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যার জন্য নির্ধারিত শাস্তি বা অনুশোচনা কিংবা কাফ্ফারা নেই (Siddiqi 1991, 159)।

অতএব হদ্দ, কিসাস ও কাফফারার আওতা বহির্ভূত কোন অপরাধের দায়ে অপরাধীকে যে শাস্তি দেয়া হয় ইসলামী আইনে সেই শাস্তিকে তা'যীর বলে। তবে নসের সমর্থন ব্যতীত কোন কর্মবর্জন বা কর্মসম্পাদনকে তা'যীরযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয় না। যেমন- মিথ্যা সাক্ষ্য দান, ঘুষ গ্রহণ, সুদ প্রদান, আমানতের খিয়ানত করা, পণ্য দ্রব্য বা ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা করা, অপরাধীদের গোপনে সাহায্য করা, কারো উপর মিথ্যা অভিযোগ প্রদান করা ইত্যাদি। এছাড়া যেসকল অপরাধের হদ্দ সুনির্দিষ্ট কিন্তু তার প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়নি তাও এ তাযীর হিসেবে গণ্য। যেমন: নিসাব পরিমাণের কম মূল্যের দ্রব্য চুরি এবং অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখা দ্রব্য চুরি করা প্রভৃতি।

তা'যীরের আইনগত ভিত্তি

তা'যীরী শাস্তি কুরআন, সুন্নাহ্, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত। আল-কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে,

﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾

আর স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতা আশঙ্কা করো, তাদের সদুপদেশ দাও। অতঃপর তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং তাদেরকে প্রহার করো। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহান, শ্রেষ্ঠ (Al-Qurān, 4: 34)।

উপর্যুক্ত আয়াতে পর্যায়ক্রমে তিন প্রকার তা'যীরী শাস্তি উল্লিখিত হয়েছে। যথা: সদুপদেশ, শয্যাত্যাগ ও প্রহার। উক্ত তিনটি বিষয়ের কোনটিই হদ্দ এর আওতাভুক্ত শাস্তি নয়। তা'যীরী শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ.

তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সে পদার্পণ করতেই তাদেরকে সালাত আদায়ের নির্দেশ দাও। তারা দশ বছর বয়সে পদার্পণ করলে এর জন্য তাদেরকে প্রহার করো (Abū Dā'ūd ND, 495)।

আবূ বুরদাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেন,

لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.

আল্লাহ্‌র নির্ধারিত হদ্দসমূহ ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে দশটি বেত্রাঘাতের উর্ধ্বে দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না (Al-Bukhārī 1987, 6848; Al-Tirmīdhī 1985, 1463)।

তা'যীরী শাস্তি উম্মতের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইবনু কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ্ (র) (মৃত ৭৫১ হি./১৩৫০ খ্রি.) বলেন,

اتفق العلمآء على أن التَّعْزِيرُ مشروع في كُلِّ مَعْصِيَةٍ ليس فيها حد بحسب الجناية في العظم والصغر وبحسب الجانى في الشر وعدمه.

আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, যেসব অন্যায় কাজে অপরাধের গুরুতরতা কিংবা ক্ষুদ্রতার অনুপাতে এবং ন্যায় ও অন্যায়ে অপরাধীর ভূমিকার দৃষ্টিতে কোন হদ্দ নির্দিষ্ট হয়নি, সেসব ক্ষেত্রেই তা'যীর বিধিবদ্ধ (Ibn Qayyim1991, 76)।

অপরাধ বিচিত্র ধরনের এবং তার শাস্তিও বিচিত্র ধরনের। সুতরাং সর্বপ্রকারের অপরাধে হদ্দ নির্ধারণ ও তার শাস্তি পরিমিতকরণ কোন বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ হতে পারে না। শরী'আতে কেবল বিশেষ বিশেষ অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। সেগুলো ব্যতীত অন্যান্য অপরাধের শাস্তি নির্ধারণের দায়িত্ব প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের ওপর অর্পিত। তারা অপরাধীর অবস্থা, অপরাধের মাত্রা অনুধাবন করে উপযুক্ত দণ্ড বিধান করবেন। এসব দণ্ডবিধানকেই ইসলামী আইনে তা'যীরী শাস্তি বলা হয়।

তা'যীর বা সাধারণ শাস্তির প্রকারভেদ

অপরাধ হিসেবে তা'যীর সাধারণত দুপ্রকার। যথা:

ক. حَقُّ الله বা আল্লাহ্র অধিকার লংঘন জনিত অপরাধের তা'যীর

আল্লাহ্র অধিকার লংঘনজনিত অপরাধ বলতে বোঝায়, যেমন- সুস্থ সবল হওয়া সত্ত্বেও সালাত না পড়া, বিনা কারণে রমযানের রোযা না রাখা, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ ও যাকাত আদায় না করা অথবা এমন কোন অশ্লীল কাজ করা ইসলামী শরী'আতে যার কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান নেই। এক্ষেত্রে বিচারক অপরাধীকে কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে শাস্তি প্রদান করবেন। আল্লাহ্র বিধান লংঘনজনিত অপরাধে যে অপরাধী হবে জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট তার তা'যীরকে মওকূফ করবেন না। তবে বিচারক যদি মনে করেন, অপরাধী তা'যীর ছাড়াই সংশোধিত হয়ে যাবে তাহলে তাকে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমাও করতে পারেন (Amīr 2006, 52)।

খ. حَقُّ الْعِبَاد তথা বান্দার অধিকার ক্ষুণ্নজনিত অপরাধের তা'যীর

বান্দার অধিকার ক্ষুণ্নকরণ অপরাধ বলতে বোঝায় মানহানি করা বা কাউকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে আদালতে মামলা দায়ের না হওয়া পর্যন্ত বিচারক অপরাধীকে কোনরূপে শাস্তি দিতে পারবেন না। এ প্রকারের তা'যীর মূলত ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ইচ্ছা করলে মামলা দায়ের করতে পারে, এমনকি মামলা দায়ের করার পরও তা প্রত্যাহার করতে পারে অথবা অপরাধীকে ক্ষমা করে দিতে পারে (Amīr 2006, 53)।

তা'যীর পর্যায়ের অপরাধ

ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে হদ্দ ও কিসাসভুক্ত নির্দিষ্ট অপরাধ ব্যতীত বিশিষ্ট সব অপরাধই তা'যীরী অপরাধ। এ অপরাধগুলোর কয়েকটি ধরন রয়েছে। যেমন-

ক. কর্তব্য পালন কিংবা ওয়াজিব আদায়ে অবহেলা (Al-Fatāwā Al-Hindyia 2000, 186; Ali 2009, 312)। যেমন: সালাত পরিত্যাগ করা, যাকাত আদায় না করা, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পাওনা পরিশোধ না করা, আমানত আদায় না করা, অপহৃত সম্পদ ফিরিয়ে না দেয়া, পণ্যের ত্রুটি প্রকাশ না করা।

খ. অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ ও গালিগালাজ করা (Al-Fatāwā Al-Hindyia 2000, 185-186)। যেমন: কোন মুসলিমকে কাফির ও ফাসিক বলে গালিগালাজ করা, অথচ সে কাফিরও নয় এবং ফাসিকও নয়। কোন মুসলিমকে ইহুদী ও খ্রিস্টান বলে সম্বোধন করা, হিজড়া বলে কাউকে গালি দেয়া, হে পাপী, হে মুনাফিক, হে মদখোর, হে সুদখোর, হে দাইউস, হে আত্মসাৎকারী ইত্যাদি ভাষায় গালি দেয়া।

গ. নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া (Al-Fatāwā Al-Hindyia 2000, 186; Ali 2009, 312)। যেমন: বেগানা মহিলাকে চুম্বন করা, পর-নারীর সঙ্গে নির্জনে সময় কাটানো, প্রাণীর সঙ্গে সঙ্গম করা, খাদ্যে ভেজাল দেয়া, মাপে কম দেয়া, খাদ্য দ্রব্য গুদামজাত করা, প্রতারণা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, দুর্নীতি করা, দায়িত্ব পালনে ফাঁকি দেয়া, সুদ খাওয়া, ঘুষ দেয়া, ঘুষ খাওয়া, সমকামিতা, মদ ও জুয়ার আসরে যোগদান করা, নৈতিকতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করা, ব্যভিচার ব্যতিরেকে কাউকে অন্য কোন অপরাধের অপবাদ দেয়া, বিনা কারণে কাউকে অপমান ও অপদস্ত করা, মিথ্যা মামলা করা, গোয়েন্দাগিরি করা, অন্যায়ভাবে মারধর করা, ন্যায় কাজে বাধা দেয়া, অধিকার খর্ব করা, ন্যায়পন্থী সরকারের ন্যায় সঙ্গত কাজে বাধা সৃষ্টি করা, কারো বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা। এক কথায় হদ্দ ও কিসাস জনিত অপরাধ ব্যতীত অবশিষ্ট সকল ধরনের অপরাধ তা'যীর পর্যায়ের অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

তা'যীরের ধরন ও প্রকরণ

তা'যীর বা সাধারণ শাস্তি যেহেতু অনির্ধারিত শাস্তি সেহেতু বিজ্ঞ বিচারক সুবিবেচনার দ্বারা এ শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করবেন। কেননা তা'যীর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অন্যায় অপকর্ম থেকে অপরাধীকে বিরত রাখা এবং অপরাধকর্মকে প্রতিহত করা। মানুষ সৃষ্টিগতভাবে সকলে একই স্বভাবের নয়। কেউ কোমল আবার কেউ কঠোর। কেউ মৃদু ধমক অথবা তিরস্কারে সংশোধন হয়। আবার কেউ কঠোর ধমক অথবা মারধরে সংশোধিত হয়। এ পর্যায়ে কাউকে আবার ধমক তিরস্কারের পরিবর্তে সংশোধনের জন্য শাস্তির নিমিত্তে বন্দী করতে হয়। তাই সব তা'যীরের নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই। অপরাধের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞ বিচারক তার সুবিবেচনার আলোকে যে দণ্ড সুনিশ্চিত করবেন অথবা যে শাস্তি নিরূপণ করবেন মূলত তাই তা'যীর বা সাধারণ শাস্তি বলে গণ্য হবে (Ibn Humām ND, 257)। তাই তা'যীরের শাস্তি বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কতিপয় তা'যীরী শাস্তির বিভিন্ন ধরন, তার যৌক্তিকতা ও দর্শন তুলে ধরা হলো:

১. মৃত্যুদণ্ড (اَلْقَتْلُ)

ইসলামী শরী'আতের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তা'যীরের আওতায় কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া বৈধ নয়। কেননা আল-কুরআনে কেবল হত্যার পরিবর্তে হত্যাকে বৈধ করা হয়েছে (Al-Qurān, 2: 278)। এছাড়াও আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

তোমরা এমন কাউকে বিনা অধিকারে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা নিষিদ্ধ করেছেন (Al-Qurān, 6: 51)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

﴿لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالْمُفَارِقُ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ﴾

তিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন মুসলিমের রক্ত হালাল নয়। এরা হলো, অন্যায়ভাবে অপরকে হত্যাকারী, বিবাহিত ব্যভিচারী এবং মুসলিম দল ও ধর্মত্যাগকারী ব্যক্তি (Al-Bukhārī 1987, 6878; Ibn Mājah ND, 2534)।

এ তিন শ্রেণির ব্যক্তি ছাড়াও কতিপয় বড় বড় অপরাধে তা'যীরস্বরূপ অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে বলে বিপুল সংখ্যক ইসলামী শরী'আত বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে কোন মারাত্মক অপরাধ বারবার সংঘটিত করলে জাতীয় ঐক্য ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার তাকিদে তা'যীরস্বরূপ অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া বৈধ (Ibn Nujaym ND, 123, Ali 2009, 314)। এ বিষয়ে হানাফী মাহযাবের মূলনীতি হলো, যে সমস্ত অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয় সে সমস্ত অপরাধ যদি কোন ব্যক্তি বারবার করে তাহলে বিচারক তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারবেন। অনুরূপভাবে কোন নির্দিষ্ট শাস্তি বা হদ্দ এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হলে বা তাতে কল্যাণ মনে করা হলে বিচারক অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবেন। কেননা নবী করীম ﷺ ও সাহাবীগণ কর্তৃক এ ধরনের অপরাধে দোষী ব্যক্তিদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার অনেক দৃষ্টান্ত হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। এ ধরনের মৃত্যুদণ্ডকে রাজনৈতিক দণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে (Ibn Taimiyyah 2001, 114; 'Awdah ND, 3)। তেমনিভাবে চুরির শাস্তি হলো হাত কাটা। কিন্তু চোর যদি বারবার চুরি করে এর প্রেক্ষিতে শাস্তিস্বরূপ একাধিকবার তার হাত কাটা সম্ভব নয়। এজন্য বিচারক সামাজিক প্রয়োজনে বারবার চুরি করার কারণে চোরকে সর্বোচ্চ (সাজা) তা'যীর হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারবেন। অথবা কোন সন্ত্রাসীর বারবার সন্ত্রাসের ফলে সমাজের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে থাকলে তাকেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া যেতে পারে (Ibn ʿĀbidīn 2003, 6/280; Al-Ramlī ND, 20; 'Awdah ND, 669)।

যাদুকরকে হত্যা করা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক মারফু' হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। জুন্দুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ যাদুকরের শাস্তি হলো তলোয়ার দ্বারা আঘাতের মাধ্যমে হদ্দ প্রয়োগ করা (Al-Tirmīdhī 1985, 1460)।

উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাজ কর্মচারীদেরকে লিখেছিলেন, اِقْتلوا السَّاحِرَ وَالسَّاحِرَةَ "যাদুকর পুরুষ ও নারীকে হত্যা কর (Ibn Qudāmah 1997, 10/116)। অনুরূপ উমর, উছমান, হাফ্সা, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, যাদুকরকে কুফরীর ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করার কারণে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে (Shaltut 1966, 301)। তবে অধিকাংশ ইসলামী আইনবিদের মতে তাকে বিধিবদ্ধ দণ্ড হদ্দ হিসেবে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে হবে (IBIT)।

যেমন আরফাজাহ্ আল-আশজা'ঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ.

তোমরা এক ব্যক্তির শাসনাধীনে থাকা অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি এসে তোমাদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করতে চায়, তবে তোমরা তাকে হত্যা করো (Muslim 2003, 4798)।

এ সম্পর্কে দায়লাম আল-হিমইয়ারী (র) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, আমরা এমন একটি দেশের অধিবাসী যেখানে আমরা কঠোর কষ্টদায়ক কাজের সম্মুখীন হই এবং শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে আমরা গম থেকে এক প্রকার পানীয় তৈরি করে থাকি। যার ফলে আমরা শীত কাতরতা থেকে রক্ষা পাই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তাতে কি নেশা সৃষ্টি হয়? আমি বললাম, হ্যাঁ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাহলে তোমরা তা পরিহার করো। আমি বললাম, فَإِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ "লোকেরা তা পরিহার করবে না।" তখন তিনি বললেন, فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ "যদি তারা ত্যাগ না করে, তাহলে তাদেরকে তোমরা হত্যা করো (Abū Dā'ūd ND, 3683)।

এ নির্দেশনা এজন্য যে, মাদকতা বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী ও আত্মহননকারীর মত। যখন আত্মহনন হত্যা ব্যতীত সম্ভব না হয়, তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করাই শ্রেয় (Ibn Taimiyyah 2004, 44)।

সমকামিতার অপরাধ বারবার সংঘটিত হলে কিংবা কঠোরতার সঙ্গে সম্পদ লুণ্ঠন করা ইত্যাদি কর্ম করলে হত্যা দ্বারা এর প্রতিবিধান করা যাবে। অনুরূপভাবে মুসলমানদের শত্রুপক্ষের অনুকূলে কোন গোষ্ঠী গোয়েন্দাগিরি করলে তাকেও হত্যার মাধ্যমে তা'যীরী শাস্তি কার্যকর করা বৈধ (Ibn Taimiyyah 2004, 63-64; 'Awdah ND, 669)।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কিরাম (রা) এ ধরনের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলেও মৃত্যুদণ্ডাদেশ যেহেতু সব সময় অস্বাভাবিক শাস্তি হিসেবে গণ্য হয়। তাই তা শুধুমাত্র বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই তা'যীরী শাস্তি হিসেবে প্রয়োগ করা উচিত।

মৃত্যুদণ্ডের দর্শন হলো, লঘু অপরাধে নয় বরং জঘন্য অপরাধের শাস্তি হিসেবে তা'যীরস্বরূপ মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়। তাই সমাজে কেউ যদি গুরুতর অপরাধ করে তাহলে তাকে তা'যীরস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা জায়েয। এর দ্বারা সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে এবং সমাজের সাধারণ জনগণ উক্ত (অপরাধের) শাস্তির ভয়াবহতা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে অপরাধ সংঘটিত করা থেকে দূরে থাকবে। ফলে সমাজে গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হবার পরিমাণ হ্রাস পাবে।

২. বেত্রাঘাত (اَلْجَلْد)

তা'যীরী শাস্তি হিসেবে বেত্রাঘাত বা প্রহারের বিষয়ে ইসলামী আইন বিশারদগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। বেত্রাঘাত দ্বারা আসামীকে একমাত্র শিষ্টাচার শিখানো এবং সংশোধন করা উদ্দেশ্য। এটি কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা অবাধ্য স্ত্রীদের শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্য স্বামীকে প্রহারের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾

আর স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতা আশঙ্কা করো, তাদের সদুপদেশ দাও; অতঃপর তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং তাদেরকে প্রহার করো (Al-Qurān, 4: 34)।

অনুরূপভাবে হাদীসেও তা'যীরী শাস্তি হিসেবে বেত্রাঘাত করার নির্দেশ বিদ্যমান। যেমন- নবী করীম ﷺ বলেন,

لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.

আল্লাহ্র নির্ধারিত হদ্দগুলো ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে দশটি বেত্রাঘাতের উর্ধ্বে দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না (Al-Bukhārī 1987, 6848)।

ইসলামী রাষ্ট্রের খোলাফায়ে রাশেদীনও তাদের উত্তরসূরী মুসলিম শাসকগণ তা'যীরী শাস্তি কার্যকর করেছেন, ইসলামী আইনবিদগণ তা'যীরী অপরাধসমূহে বেত্রাঘাতের বৈধতার পক্ষে মতামত দিয়েছেন। এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে ইজমা (ঐক্যমত্য) সংঘটিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ: মদ্যপায়ীকে হাতের দ্বারা প্রহারের সঙ্গে সঙ্গে জুতা ও কাপড়ের দ্বারা তা'যীরের শাস্তি প্রদানের বিধান রয়েছে।

উপর্যুক্ত আয়াত ও সুন্নাহ্র বক্তব্য দ্বারা এটিই প্রতীয়মান হয় যে, তা'যীরী শাস্তি হিসেবে বেত্রাঘাত করার বিষয়টি আল-কুরআন, আল-হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। তাই অপরাধীকে অপরাধের মাত্রানুযায়ী বিচারক বেত্রাঘাত দণ্ড দিতে পারেন, এটি যুক্তিযুক্ত।

তা'যীরী শাস্তি হিসেবে অপরাধীকে বেত্রাঘাত দণ্ড প্রদান করা হয় মূলত তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে এবং সংশোধনের উদ্দেশ্যে। যাতে পরবর্তীতে অপরাধী অনুরূপ অপরাধ সংঘটিত করার সাহস না পায় এবং সমাজের অন্যরাও যেন অপরাধ হতে বিরত তাকে। ফলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা অনেকটাই হ্রাস পাবে।

তবে এই বেত্রাঘাতের মাত্রা বা পরিমাণ কেমন হওয়া উচিত। তা নিয়ে ইসলামী আইনবিদগণের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়।

ক. বেত্রাঘাতের সর্বনিম্ন পরিমাণ

বেত্রাঘাতের সর্বনিম্ন পরিমাণের ব্যাপারে অধিকাংশ ইসলামী আইনবিদ একমত যে, বিচারক যদি মনে করেন কোন অপরাধীর জন্য শাস্তি হিসেবে একটি মাত্র বেত্রাঘাতই যথেষ্ট, তাহলে এর অতিরিক্ত শাস্তি প্রদান করা সমীচীন নয় (Amīr 2006, 321; Ali 2009, 315)। তবে হানাফী আইনবিদগণের মতানুযায়ী সর্বনিম্ন বেত্রাঘাতের পরিমাণ হলো তিনটি (Ibn ʿĀbidīn 2003, 6/104)।

খ. বেত্রাঘাতের সর্বোচ্চ পরিমাণ

বেত্রঘাতের সর্বোচ্চ পরিমাণ নিয়ে ফকীহ্গণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মাযহাবে জাদীদ অনুযায়ী এবং ইমাম আহমদ (র)-এর এক মতে তা'যীরী শাস্তিস্বরূপ বেত্রাঘাতের সর্বোচ্চ পরিমাণ হলো ৩৯টি বেত্রাঘাত (Ibn ʿĀbidīn 2003, 6/103; Ibn Qudāmah 1997, 10/ 348)।

তাঁদের দলীল

তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাদীস দ্বারা দলীল উপস্থাপন করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ.

যে ব্যক্তি হদ্দ বহির্ভূত অপরাধে হদ্দ এর সমান শাস্তি দিবে সে সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (Al-Bayhaqī 2003, 17585)।

আর হদ্দ এর নিম্নতম পরিমাণ হলো ৪০টি বেত্রাঘাত, যা দাস-দাসীদের জন্য ব্যভিচারের অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং তা'যীরের সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে ৩৯টি বেত্রাঘাত (Ali 2009, 316)।

কতিপয় শাফি'ঈ মতাবলম্বী আইনবিদ ও আহমদ (র)-এর প্রসিদ্ধ মতে, তা'যীর হিসেবে ১০টির বেশি বেত্রাঘাত করা যাবে না (Ibn Ḥajar 1379H, 12/218; Ibn Qudāmah 1997, 347)। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.

আল্লাহ্র নির্ধারিত হদ্দগুলো ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে দশটি বেত্রাঘাতের উর্ধ্বে দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে না (Al-Bukhārī 1987, 6848; Muslim 2003, 1708)।

ইমাম মালিক (র)-এর মতে, তা'যীরী শাস্তি হিসেবে বেত্রাঘাতের নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই। প্রয়োজনে হদ্দের চাইতেও বেশি শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে (Mālik 1985, 547)। এ মতের পক্ষে দলীল হলো, আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-এর কর্ম। বর্ণিত আছে, আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) এমন অবিবাহিত দুজন নারী ও পুরুষকে একশটি করে চাবুক মারার আদেশ দিয়েছিলেন, যাদের একই চাদরের নীচে পাওয়া গিয়েছিল (Al-Mutlaq & Al-Arfaz, 1424H, 180; Rahim 2006, 261)।

এ সম্পর্কে আরও একটি বর্ণনায় এসেছে, এক ব্যক্তি প্রতারণা পূর্বক তার আংটির উপর নকশা অঙ্কন করে বায়তুল মাল থেকে অর্থ আত্মসাৎ করলে উমর (রা) প্রথম দিন একশতটি, দ্বিতীয় দিন একশতটি এবং তৃতীয় দিনও একশতটি বেত্রাঘাত করেছিলেন (Ibn Farḥūn 1986, 2/293)।

বেত্রাঘাতের সর্বোচ্চ সীমা সম্পর্কিত অভিমতগুলোর মধ্যে ১০টি বেত্রাঘাতের অভিমতটি বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হওয়ায় তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

অতএব, বিচারক স্থান কাল পাত্রভেদে অপরাধীকে তা'যীরস্বরূপ বেত্রাঘাতের দণ্ড দিতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে, অপরাধের মাত্রাতিরিক্ত যেন বেত্রাঘাত করা না হয়। যাকে দুটো বেত্রাঘাত করলে যথেষ্ট তাকে দুটোর বেশি বেত্রাঘাত করা যাবে না। আর যাকে দশটি বেত্রাঘাত করা প্রয়োজন তাকে তাই করতে হবে। অর্থাৎ অপরাধীকে অপরাধের মাত্রানুযায়ী এ দণ্ড প্রদান করতে হবে। এর যৌক্তিকতা হলো অপরাধীকে যখন বেত্রাঘাত দণ্ড প্রদান করা হবে তখন সে শাস্তির ভয়ে পরবর্তীতে আর উক্ত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হবার প্রয়াসী হবে না। পাশাপাশি যারা এ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তারাও শাস্তির ভয়াবহতা উপলব্ধিপূর্বক সামাজিক অপরাধে জড়িত হবার সাহস পাবে না। ফলে সার্বিকভাবে সমাজে অপরাধের মাত্রা হ্রাস পাবে এবং সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।

৩. আর্থিক দণ্ড বা জরিমানা (اَلْغَرَامَة)

তা'যীরী শাস্তি হিসেবে আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত করা যেতে পারে। তবে এ ব্যাপারে ইসলামী আইনবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও মুহাম্মদ (র) তা'যীর হিসেবে কোন অপরাধের জন্য কাউকে আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত করা বৈধ নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন (Ibn ʿĀbidīn 2003, 6/106)। ইমাম শাফি'ঈ (র) পুরাতন মতানুযায়ী বৈধ এবং নতুন মতে অবৈধ (Ibn Taymiyyah 2004, 40; Amīr 2006, 370)। তাঁদের যুক্তি হলো, এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোন দলীল পাওয়া যায় না এবং এ শাস্তি রহিত হয়েছে। তাছাড়া কারো সম্পদ আইনসম্মত কোন কারণ ব্যতীত গ্রহণ করা বৈধ নয় (Ibn ʿĀbidīn 2003, 6/106)। অপরপক্ষে ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ও হানাফী আইনবিদ ইমাম আবূ ইউসুফ (র) আর্থিক দণ্ড বৈধ বলে মনে করেন (Ibid.)। তাঁরা এ শাস্তির আইনগত ভিত্তি হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কয়েকটি ফয়সালাকে প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাকাত দিতে অস্বীকারকারীর সম্পদের অর্ধেক বাজেয়াপ্ত করার মাধ্যমে তা'যীর করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا.

যে ব্যক্তি পুরস্কারের (সাওয়াবের) উদ্দেশ্যে তা প্রদান করলো, ইবনুল আলা বলেন, 'যে সাওয়াবের জন্য প্রদান করল', সে (আল্লাহ্র নিকট) তাই পাবে। আর যে ব্যক্তি তা দিতে অস্বীকার জানালো, আমি তা উসুল করবোই এবং তার মালের অর্ধেক নেব। কেননা এটাই আমাদের মহান পরাক্রমশালী প্রভুর হক বা অধিকার (Abū Dā'ūd ND, 1575)।

অনুরূপভাবে অরক্ষিত সম্পদ কেউ চুরি করলে তাকে দ্বিগুণ জরিমানার শাস্তি প্রদানের ফয়সালা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ.

যদি কোন অভাবী লোক তার প্রয়োজন অনুপাতে তা খায় এবং কাপড় ভরে না নেয়, তাতে কোন অপরাধ হবে না। আর যদি কেউ কাপড় ভরে নেয়, তবে তাকে তার দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে তাকে শাস্তিও ভোগ করতে হবে (Abū Dā'ūd ND, 1710, 4390)।

উল্লিখিত হাদীস দুটি প্রমাণ করে যে, আর্থিক দণ্ডের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক স্বীকৃত। তা'যীরী শাস্তি হিসেবে আর্থিক দণ্ডের বৈধতা-অবৈধতার ব্যাপারে আইনবিশারদদের মতামত পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আরম্ভ করে খোলাফায়ে রাশেদুন এবং পরবর্তী সময়ে আর্থিক দণ্ডের শাস্তির বিধান কার্যকর হয়ে এসেছে। যারা এ শাস্তি রহিত হওয়ার কথা বলেন তা সঠিক নয়। কেননা তারা এর পক্ষে কোন শক্তিশালী দলীল পেশ করতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে ইবন কায়্যিম (র)-এর মন্তব্যটি ইব্ন ফারহুন উদ্ধৃত করে বলেন,

وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْعُقُوبَةَ الْمَالِيَّةَ مَنْسُوخَةٌ فَقَدْ غَلِطَ مَذَاهِبَ الْأَئِمَّةِ نَقْلًا وَاسْتِدْلَالًا، وَلَيْسَ يَسْهُلُ دَعْوَى نَسْخِهَا وَفِعْلُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَأَكَابِرِ الصَّحَابَةِ لَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبْطِلٌ لِدَعْوَى نَسْخِهَا، وَالْمُدَّعُونَ لِلنَّسْخِ لَيْسَ مَعَهُمْ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ وَلَا إِجْمَاعٌ بِصَحِيحِ دَعْوَاهُمْ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا لَا يَجُوزُ

যারা বলে আর্থিক দণ্ড রহিত, তারা বর্ণনা ও দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন দু'দিক দিয়েই ইমামদের মতামতের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। এটি রহিত হওয়ার দাবি করা খুব সহজ নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর খোলাফায়ে রাশেদুন এবং বড় বড় সাহাবায়ে কিরাম আর্থিক দণ্ডের শাস্তি প্রয়োগ করেছেন যা এর রহিত হওয়ার দাবিকে তিরোহিত করে। রহিত হওয়ার দাবির পক্ষে কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা থেকে কোন দলীল নেই, যা তাদের দাবিকে সঠিক প্রমাণিত করে। তাদের কেউ শুধু এতটুকু বলতে পারেন, আমাদের ইমামদের মতে বৈধ নয় (Ibn Farḥūn 1986, 2/293)।

আর্থিক দণ্ড বা জরিমানা প্রদান তা'যীরী শাস্তি হিসেবে যৌক্তিক। বর্তমান যুগে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিযুক্ত মাজিস্ট্রেটগণ পণ্যে ভেজাল দেয়া, পণ্য দ্রব্যের মূল্য বেশি নেয়ার অপরাধে অপরাধীকে (বিক্রেতাগণকে) মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে আর্থিক দণ্ড বা জরিমানা আরোপ করে থাকেন।

এর দর্শন হলো, এই আর্থিক দণ্ড বা জরিমানা প্রদানের মাধ্যমে অপরাধীকে সতর্ক করে দেয়া যে, সে যেন পরে এ ধরনের অপরাধ না করে। ফলে অপরাধী আর্থিক দণ্ড দেয়ার ভয়ে পরবর্তীতে আর এ ধরনের অপরাধ কর্মে লিপ্ত হতে চাইবে না। সমাজে তখন অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পাবে।

৪. আটক/কারাদণ্ড (اَلْحَبْس)

অপরাধীকে আটক রেখে তা'যীরী শাস্তি প্রদানের দণ্ডবিধি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাহ্, সাহাবীগণের কর্মনীতি ও উম্মতের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। যেমন- আমর ইব্ন শারীদ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ قَالَ عَلِيٌّ الطَّنَافِسِيُّ: يَعْنِي عِرْضَهُ شِكَايَتَهُ، وَعُقُوبَتَهُ سِجْنَهُ.

যে সক্ষম ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করে, আমার জন্য তার ইয্যত (হানি করা) এবং শাস্তি দেয়া উভয়ই বৈধ। আলী তানাফিসী (র) বলেন, ইয্যত বৈধ হবার অর্থ হলো তাকে কটুকথা বলা এবং শাস্তি দেয়ার অর্থ হলো তাকে আটক করা (Ibn Mājah ND, 2427, Abū Dā'ūd ND, 3628)।

এ বিষয়ে বাহ্য ইব্ন হাকীম (রহ.) তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْهُ.

নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে অভিযোগের ভিত্তিতে আটক করে পরে তাকে ছেড়ে দেন (Al-Tirmīdhī 1985, 1417, Al-Nasayī 1420H, 4876)।

হিরমাস ইব্ন হাবীব (রহ.) তাঁর দাদা (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَرِيمٍ لِي، فَقَالَ لِي: الْزَمْهُ، ثُمَّ مَرَّ بِي آخِرَ النَّهَارِ، فَقَالَ: مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ؟

আমি আমার ঋণের দায়ে দায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে নিয়ে নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি আমাকে উক্ত ব্যক্তিকে আটক করে রাখার নির্দেশ দিয়ে বললেন, এর পিছনে লেগে থাকো। অতঃপর দিনের শেষে তিনি আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং বললেন, হে বনী তামীমের ভাই! তোমার বন্দি কী করছে? (Ibn Mājah ND, 2428)

এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র) কিছু তা'লীকাত উল্লেখ করেছেন। যেমন- নাফি' ইব্ন আব্দুল হারিছ কারাগার তৈরির উদ্দেশ্যে মক্কায় সাফ্ওয়ান ইব্ন উমাইয়ার কাছ থেকে এ শর্তে একটি ঘর ক্রয় করেছিলেন যে, যদি উমর (রা) সম্মত হন তবে ক্রয় পূর্ণ হবে। আর যদি তিনি সম্মত না হন তাহলে সাফ্ওয়ান চারশত দীনার পাবেন। ইব্ন যুবায়র তাঁর শাসনামলে মক্কায় লোক আটক করেছেন (Al-Bukhārī 1987, 2422)।"

ইবনুল কায়্যিম (র) বলেন, "আর এটিই ছিল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগের ও আবূ বকর (রা)-এর যুগের আটক করে রাখার ঘটনা। তাঁদের সময়ে আটক করে রাখার কোন সুনির্দিষ্ট স্থান ছিল না, যেখানে বিবাদীকে আটক করে রাখা যায়। অতঃপর যখন উমর (রা)-এর যুগে নাগরিকরা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে তখন তিনি মক্কা নগরীতে একটি ঘর ক্রয় করে কারাগার বানালেন, যেখানে লোকদের আটক করে রাখা হতো (Ibn Farḥūn 1986, 2/396)।"

আর এভাবেই স্বাধীন অপরাধী ব্যক্তিকে আটক রাখার ব্যবস্থা করা হলো। বিচারকের ইখতিয়ার রয়েছে যে, কোনো এক স্থানে পুলিশী তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত সময়ের জন্য অপরাধী ব্যক্তিকে কষ্ট প্রদানস্বরূপ আটক রাখা, আর তা কারামুক্ত হওয়ার পরও করা

যেতে পারে। অথবা দায়গ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত আটক করে রাখার নির্দেশও বিচারক দিতে পারেন। যেরূপ নবী করীম ﷺ করেছেন।

এ ধরনের আটকাদেশ ব্যক্তি পর্যায়ে অভ্যাসগত অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি হিসেবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। আরো এমন সব ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে হতে পারে, যে ক্ষেত্রে অপরাধীর মনে অসৎ উদ্দেশ্য আছে বলে প্রতীয়মান হয় না। অনুরূপভাবে অভ্যাসগত সাধারণ অপরাধীকে এরূপ শাস্তি দেয়া যেতে পারে, যারা অপরাধ কর্মসংঘটিত করাকে অভ্যাস হিসেবে ঘটায়নি বলে প্রতীয়মান হয়। এ ধরনের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আটকাদেশ প্রদান সম্পর্কে বিচারক যদি ভাল মনে করেন দিতে পারেন (Ibn Taymiyyah 2004, 61; Amīr 2006, 370)।"

মিথ্যা দোষারোপকারী যখন তার অবস্থা অজ্ঞাত থাকে, তার অবস্থা প্রকাশ হওয়া ও তার পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত আটক রাখতে হবে। আর এটিই অধিকাংশ আইনবিদগণের অভিমত। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন, "নবী করীম ﷺ মিথ্যা দোষারোপকারীকে আটক করেছেন। আর এ আটক বিচারকের নিকট তার পরিচিতি সুস্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত থাকতে পারে। আবূ হুরায়রা (রা) আল-খিলাল জামে মসজিদের বক্তৃতায় বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ এক দিন ও এক রাত মিথ্যা দোষারোপকারীকে আটক রেখেছিলেন। ইমামগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন (Kamal 2006, 112)।"

অপরাধীকে আটক বা কারাদণ্ড প্রদান করা যৌক্তিক। কেননা কারাগারে আটক করে রাখার উদ্দেশ্য অপরাধীকে সংশোধন করা এবং সুশিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে তাকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা।

৫. নির্বাসন বা দেশান্তর (النفي)

আরবী ভাষায় النَّفي এর অর্থ الطرد، الابعاد তথা বিতাড়িত করা (Ibn Jarīr 1997, 4/560)। পরিভাষায় অপরাধীকে অপরাধ সংঘটনের শহর থেকে অন্য শহরে বিতাড়িত করাকে নির্বাসন বলে (Rahman 1421H, 616)। বিচারক জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করলে অপরাধীকে তা'যীরস্বরূপ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাসনের দণ্ড দিতে পারেন। এ ধরনের শাস্তি রাসুলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাহ্ এবং সাহাবীদের কর্মনীতির মাধ্যমে সাব্যস্ত। যেমন- আবু হুরায়রা (রা) বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَّبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُ هَذَا؟ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ: إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ» قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: وَالنَّقِيعُ نَاحِيَةٌ عَنِ الْمَدِينَةِ وَلَيْسَ بِالْبَقِيعِ.

একদা নবী করীম ﷺ-এর নিকটে একজন নপুংসককে নিয়ে আসা হয়। যার দুহাত ও পা মেহেদী রংয়ে রঞ্জিত ছিল। তখন নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন এ ব্যক্তির অবস্থা কী? জবাবে সাহাবীগণ বললেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল! এ ব্যক্তি স্ত্রী

লোকদের সাজ সেজেছে। তখন তিনি তাকে শহর থেকে বিতাড়িত করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তাকে নাকী নামক স্থানে নির্বাসন দেয়া হয়। রাবী আবূ উছমান (র) বলেন, নাকী স্থানটি মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত। এটা বাকী'-এর অন্তর্গত নয় (Abū Dā'ūd ND, 4928)।

অনুরূপভাবে উমর (রা) মহিলাদেরকে ফিতনায় ফেলার কারণে নাস্‌র ইব্‌ন হাজ্জাজকে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্য গুদামজাত করার অপরাধে উমাইয়া ইব্‌ন ইয়াযীদ ও মুযায়নার মাওলাকে নির্বাসনের দণ্ড দিয়েছিলেন (Ibn Ḥajar 1379H, 12/195)। অনুরূপভাবে ছবীগ ইব্‌ন আসালকে 'আয্‌-যারিয়াত ও আল-মুরসালাত' ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিকব্যাখ্যা না করায় উমর (রা) তাকে বসরায় নির্বাসন করার পর নির্দেশ দিয়েছিলেন, সবাই যেন তাকে বয়কট করে, কেউ যেন তার সঙ্গে মেলামেশা না করে। মা'দ ইব্‌ন যায়দাহকে বায়তুল মাল সম্পর্কে মিথ্যাচারের মামলার রায় হিসেবে নির্বাসন দিয়েছেন, কেননা সে মুসলমানদের বায়তুল মালের সম্পদকে মিথ্যাচারের মাধ্যমে আত্মসাৎ করেছিল। এজন্য তাকে বেত্রাঘাত ও আটক করার পর নির্বাসন প্রদান করা হয়েছে (Ibn Qudāmah 1997, 10/348; Ibn Humām ND, 4/136; Ibn Taimiyyah 2004, 43)। কোন কোন আইনবিদের মতে, সন্ত্রাসীদেরকে নির্বাসন, দেশান্তর ও আটক করা কিংবা রাষ্ট্র প্রধান যা ভাল মনে করেন সেটি করতে পারেন, নির্বাসন হোক অথবা অন্য কিছু হোক।

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, অপরাধীকে অপরাধ কর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য নির্বাসন দণ্ড দেওয়া যুক্তিযুক্ত। অনেক সময় অপরাধীকে অপরাধ সংঘটনের স্থান ত্যাগ করালে নতুন পরিবেশে গিয়ে সে আর অপরাধ করার সাহস পাবে না। পূর্বের অন্যায় কর্মগুলো ভুলে গিয়ে অপরাধী সংশোধিত হবে। তবে যে স্থানে অপরাধীকে নির্বাসন বা দেশান্তর করা হবে সে স্থানে তার উপর নজরদারী রাখতে হবে, যাতে সে সেখানে নতুন কোন অপরাধ কর্মে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ না পায়।

৬. উপদেশ প্রদান (الوَعظ)

উপদেশ প্রদানের অর্থ হলো, অপরাধীকে আদালতে তলব করে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা। সে যে কাজটি করেছে তা অন্যায়ভাবে করেছে। যেমন স্ত্রীদের স্বামীর অবাধ্যতা একটি অপরাধ যার কোন নির্দিষ্ট হদ্দও নেই এবং কাফ্‌ফারাও নেই। এ ক্ষেত্রে তাকে উপদেশ প্রদান হবে তা'যীরী শাস্তি। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন,

﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ﴾

আর স্ত্রীদের মধ্যে যাদের তোমারা অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদের সদুপদেশ প্রদান করো (Al-Qurān, 4: 34)।

আল-কুরআনের অনুরূপ হাদীসেও তা'যীরী শাস্তি হিসেবে উপদেশ প্রদান করার বিধানাবলি বর্ণিত হয়েছে। যেমন আবূ হুমায়দ আস্‌-সা'ঈদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ ইব্‌ন লুতবীয়্যাহ্‌ নামক এক ব্যক্তিকে বনু সুলাইম

গোত্রের যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করলেন। যখন সে ফিরে এলো তখন তিনি তার কাছে থেকে হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করলেন। সে বলল, এগুলো আপনাদের মাল, আর এগুলো (আমাকে দেয়া) উপঢৌকন। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বললেন, যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে তোমার মা-বাবার ঘরে বসে থাকলে না কেন? সেখানেই তোমার কাছে উপঢৌকন এসে যেত। এরপর তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করার পর তিনি বললেন, আমি তোমাদের কাউকে এমন কোন কাজে নিয়োগ করি, যার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহ্‌ আমাকে মনোনীত করেছেন। কিন্তু সে কাজ সম্পাদন করে এসে বলে, এ হলো তোমাদের মাল। আর এ হলো আমাকে দেয়া উপঢৌকন। তাহলে সে কেন তার মা-বাবার ঘরে বসে রইল না। সেখানে এমনিতেই তার কাছে তার উপঢৌকন এসে যেত? আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা যে কেউ অবৈধভাবে কোন কিছু গ্রহণ করবে, সে কিয়ামতের দিন তা বয়ে নিয়ে আল্লাহ্‌র সামনে হাযির হবে। আমি তোমাদের কাউকে ভালোভাবেই চিনব যে, সে আল্লাহ্‌র কাছে হাযির হবে উট বহন করে; আর উট আওয়াজ দিতে থাকবে অথবা গাভী বহন করে, আর সেটা ডাকতে থাকবে অথবা বকরী বহন করে, আর সেটা ডাকতে থাকবে। এরপর তিনি আপন হাত দুটি এতদূর উত্তোলন করলেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখা যাচ্ছিল। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? আমার চক্ষুযুগল সে অবস্থা অবলোকন করেছে এবং আমার কান শুনেছে (Al-Bukhārī 1987, 6979)।

সুতরাং অবাধ্য স্ত্রীকে বাধ্য করতে বা সংশোধন করতে এবং সমাজে সম্মানজনক ব্যক্তির দ্বারা কোনো পদস্খলন ঘটলে সেক্ষেত্রে তা'যীর স্বরূপ বিচারক তাদেরকে সদুপদেশ প্রদানের মাধ্যমে ন্যায় পথে ফিরিয়ে আনতে পারেন। এটা যৌক্তিক। এর মাধ্যমে তারা লজ্জা এবং অপমানিত বোধ করে পরবর্তীতে আর এ ধরনের অপরাধ করতে চাইবে না। ফলে এটি সমাজের অন্যদের জন্যও শিক্ষামূলক বিষয় হিসেবে প্রতীয়মান হবে। সমাজে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পাবে।

৭. তিরস্কার (اَلتَّوبيخ)

তিরস্কার কোন কথা বা কাজের মাধ্যমে হতে পারে বিচারক যেটাকে তা'যীর হিসেবে যথেষ্ট মনে করেন। অপরাধীকে তিরস্কারের শাস্তি প্রদান নস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন- আবূ যার (রা) বলেন,

إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ.

আমি এক ব্যক্তিকে গালি দেই এবং তার মায়ের বংশের খোঁটা দিয়ে তার আত্মসম্মানে আঘাত হানি। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেন, হে আবূ যার! তুমি তার মায়ের বংশের খোঁটা দিয়ে তার আত্মসম্মানে আঘাত হানলে। তোমার মধ্যে তো দেখছি জাহিলিয়্যাত (অভদ্রতা) রয়েই গেছে (Al-Bukhārī 1987, 29)।

এছাড়া আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَالَ فِيهِ بَعْدَ الضَّرْبِ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «بَكِّتُوهُ» فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَقُولُونَ: مَا اتَّقَيْتَ اللَّهَ، مَا خَشِيتَ اللَّهَ، وَمَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে এক মদ্যপায়ীকে উপস্থিত করা হলো। এ সময় তাকে বকাঝকা করার জন্য তিনি উপস্থিত লোকজনকে নির্দেশ দিলেন। তখন লোকেরা তাকে বলতে লাগলো, তোমার কি আল্লাহ্র ভয় নেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি কি তোমার লাজ-শরম নেই (Abū Dā'ūd ND, 4478)।

উপর্যুক্ত হাদীস দুটির প্রথমটিতে আবূ যারকে (রা) কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে। এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, 'অপরাধীকে শাস্তি হিসেবে তিরস্কার করতে কিংবা উপদেশ দিতে কোনো অসুবিধা নেই।' দ্বিতীয় হাদীস থেকে জানা যায় যে, অপরাধীকে তার অপরাধের জন্য তিরস্কার করার জন্য সাহাবীদের রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন।

তা'যীরী শাস্তি হিসেবে অপরাধীকে তিরস্কার করা যৌক্তিক। বিচারক যদি মনে করেন তিরস্কারের মাধ্যমে অপরাধীকে সংশোধন করা সম্ভব তাহলে তিনি তাই করবেন। তিরস্কারের মাধ্যমে সমাজের অনেক অন্যায় প্রতিরোধ করা সম্ভব। কারণ সমাজে এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা হালকা তিরস্কারেই সংশোধিত হয়ে থাকে। তাই তাদের কঠোর শাস্তি না দিয়ে তিরস্কারের মাধ্যমে সংশোধন করা যায়।

৮. বয়কট (الهجر)

বয়কট বা সমাজচ্যুতি তা'যীরী শাস্তি হিসেবে কুরআন, সুন্নাহ্ ও সাহাবীদের কর্মনীতি দ্বারা স্বীকৃত। এ ধরনের বয়কট বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন অপরাধীর সঙ্গে কথাবার্তা না বলা, মু'আমালাত ও মু'আশারাত থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। বিচারক যদি মনে করেন অপরাধীকে বয়কট করা প্রয়োজন তাহলে তিনি তা'যীরী শাস্তি হিসেবে এ ধরনের নির্দেশ প্রদান করতে পারেন।

অবাধ্য স্ত্রীকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের নিমিত্তে প্রয়োজনে শয্যা বর্জনের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾

আর স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদের সদুপদেশ প্রদান করো। অতঃপর তাদের শয্যা বর্জন করো (Al-Qurān, 4: 34)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাহতে এ ধরনের শাস্তি কার্যকর করার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কারণে তিনি তিনজন বিশিষ্ট সাহাবী কা'ব ইব্ন মালিক, মুরারাহ ইব্নুর রবী' ও হিলাল ইব্ন উমাইয়াকে (রা) বয়কট করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর পরে সাহাবীগণ পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কথাবার্তা, সালাম বিনিময় ও সামাজিক লেনদেন বন্ধ করে দেন (Al-Bukhārī 1987, 4418)। পরে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের তাওবা কবূলের মাধ্যমে ক্ষমার ঘোষণা সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ করে বলেন,

خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

আর অপর তিন জনকেও যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য তা সংকুচিত হয়েছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়েছিল এবং তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো আশ্রয়স্থল নেই, পরে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হলেন যাতে তারা তাওবা করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু (Al-Qurān, 9: 118)।

অনুরূপভাবে উমর (রা) সবীগ নামক এক ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত এবং কূফা অথবা বসরায় নির্বাসন দণ্ড প্রদানের পর জনগণকে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেন। পরবর্তীতে তথাকার প্রশাসক তার সংশোধনের বিষয়ে খলীফাকে অবহিত করলে তিনি তার উপর থেকে উক্ত দণ্ড প্রত্যাহার করে নেন (Ibn Farḥūn 1986, 2/292)।

উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায় যে, তা'যীরের শাস্তি হিসেবে অপরাধীকে সমাজ থেকে বয়কট করা যৌক্তিক। অপরাধী যদি গুরুতর অপরাধ না করে থাকে এবং তার যদি ন্যূনতম সম্মানবোধ থাকে, তাহলে আশা করা যায়, বয়কটের মাধ্যমে সে আল্লাহ্র নিকট তাওবা করে সংশোধন হয়ে যাবে। তাই লঘু কোন অপরাধ হতে অপরাধীকে সংশোধনের জন্য বয়কটের শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে।

৯. শূলে চড়ানো (الصَّلب)

তা'যীরী শাস্তির মধ্যে শূলে চড়ান অন্যতম। অধিকাংশ ইমাম মনে করেন, তা'যীর হিসেবে বিচারক সমীচীন মনে করলে জঘন্য কোনো অপরাধের জন্য অপরাধীকে জীবিত অবস্থায় তিন দিনের জন্য শুলে চড়ানোর দণ্ড দিতে পারেন। তবে তাকে শূলে চড়ানোর সঙ্গে কিংবা পূর্বে হত্যা করা যাবে না। আল-মাওয়ার্দী (র) বলেন, কেবল তিন দিনই জীবিত অবস্থায় শূলে চড়িয়ে শাস্তি দেয়া জায়েয। অতঃপর তাকে জীবিত ছেড়ে দিতে হবে। বর্ণিত আছে- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ নাবকে পাহাড়ের উপর শূলী দিয়ে তা'যীরী শাস্তি দিয়েছেন (Ali 2009, 318)। তিনি আরো বলেন, এ তিন দিনের মধ্যে তাকে খাবার, পানীয় ও সালাতের ওযু থেকে নিষেধ করা যাবে না। সে ইশারায় সালাত আদায় করবে। তবে ছেড়ে দেয়ার পর পুনরায় সালাতগুলো পড়ে নিবে। বিশিষ্ট ইসলামী আইনতত্ত্ববিদ শিরবীনী (র) বলেন, শূলী অবস্থায়ও তাকে পূর্ণ স্বস্তির সঙ্গে সালাত আদায় করতে দেয়া উচিত। অর্থাৎ সালাতের সময় তাকে ছেড়ে দিতে হবে। সালাতের পর আবার তাকে শূলে চড়াতে হবে। হাম্বলীগণের মতে, যদি সম্ভব না হয় ইশারা করেই নামায আদায় করবে; তবে মুক্ত হবার পর পুনরায় সালাতগুলো পড়ে নেয়ার প্রয়োজন নেই।

কোনো কোনো আইনবিদের মতে, হত্যা করার পরেও শূলে চড়ানো জায়েয। আবার কারো মতে, হত্যার পূর্বে শূলে চড়ানো যাবে এবং এ অবস্থায় হত্যা করতে অসুবিধা নেই। যদি হত্যা করার পর শূলে চড়ানো হয় অথবা হত্যার পূর্বে শূলে চড়িয়ে এ অবস্থায় হত্যা করা হয়, তাহলে বিশুদ্ধ মতানুসারে শূলে যে সময় পর্যন্ত রাখলে প্রচার

কার্য সম্পন্ন হবে, সে সময় পর্যন্ত শূলে রাখা জায়েয। হানাফীগণের মতে, দুর্গন্ধ বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত শূলে রাখা জায়েয। শাফি'ঈগণের মতে, তিন দিন শূলে চড়িয়ে রাখতে হবে (Ali 2009, 318)।

১০. আলোচনা (الكلام)

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য তা'যীরের ভূমিকা অপরিসীম। বিশেষ করে পারিবারিক সমস্যা নিরসনে তা'যীরের এ হুকুমটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি বিরোধ দেখা দেয় আর সে বিরোধ পারস্পরিক দায়িত্ব পালনের পরও নিরসন না হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে, স্বামীর পরিবার হতে একজন এবং স্ত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে একজন করে সালিশী নিয়োগ করে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত (Al-Qurān, 4: 35)।

সমাজে দুজন ব্যক্তির মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তা নিষ্পন্ন করা যৌক্তিক। বরং এটা উত্তম। মানব জীবনের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান কেবল পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমেই করা সম্ভব।

১১. প্রচার (اَلتَّشْهِيْر)

প্রচার বা আত্-তাশহীর বলতে অপরাধীর অপরাধকর্ম মাইকিং, ঢোল শুহরত, বেতার, টিভি ও পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে অবগত করাকে বোঝায় (Saeed 1422H, 2/93)। একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, উমর (রা) যখন কোন মিথ্যা সাক্ষ্যদান কারীকে তা'যীরী শাস্তি প্রদান করতেন তখন তার মুখে কালি মেখে দিতেন এবং সম্প্রদায়ের নিকট ঘুরিয়ে অপকর্ম প্রচারের নির্দেশ দিতেন। আর বলা হতো এ হলো মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী, অতএব তোমরা তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না (Al-San'anī 1403H, 8/327)।

বাজারে মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীর নাম শুধু প্রচার করা হবে। অন্য কোন তা'যীরী শাস্তি দেয়া যাবে না। এটি ইমাম ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। সাহেবাইনের মতে, তাকে হত্যা করে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান ও বন্দী করা হবে। ইমাম শাফি'ঈ (র)ও অনুরূপ মত পোষণ করেন। তিনি উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা) মিথ্যাসাক্ষ্য দানকারীকে চল্লিশ বেত্রাঘাত করে তার চেহারায় দাগ লাগিয়ে দেন (Kamal 2006, 116-117)।

কাযী শুরায়হ্ (র) মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীর নাম বাজারে ঢোল পিটিয়ে প্রচার করতেন, বেত্রাঘাত করতেন না। যদি সে বাজারী লোক হতো তাহলে তাকে তিনি বাজারে প্রেরণ করতেন। আর যদি সে বাজারী না হয়, তবে তাকে আসরের সালাতের পরে লোকালয়ে পাঠিয়ে ঘোষক ঘোষণা করতো, আমরা এ মিথ্যাবাদী সাক্ষ্যদানকারীকে পেয়েছি। আপনারা তার সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন, আর তার সম্পর্কে লোকেরাও যেন সতর্ক থাকে (Al-Sarakhsī 1989, 16/145)। বর্তমান সমাজে এ ধরনের শাস্তি প্রতীয়মান হয়।

১২. ভীতি প্রদর্শন (اَلتَّهْدِيد)

তা'যীরী শাস্তি হিসেবে বিচারক অপরাধীকে ভীতি প্রদর্শন করতে পারেন। আর এটি এমন এক প্রকার শাস্তি, যা দ্বারা অপরাধীকে শাস্তির ভয় দেখিয়ে অপরাধ হতে বিরত রাখা হয়। বিচারক অপরাধীকে এ মর্মে ভীতি প্রদর্শন করবেন যে, যদি সে পুনরায় অপরাধ করে তাহলে তাকে চাবুক মারা হবে বা তাকে বন্দী করা হবে অথবা এর চেয়ে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে। তবে শর্ত এই যে, ভীতি প্রদর্শন মিথ্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে না এবং বিচারক যদি মনে করেন যে, এ পন্থা তাকে সংশোধন ও অপরাধ হতে নিবৃত্ত করার জন্য যথেষ্ট ('Awdah ND, 702-703; Rahman 1992, 239)।

তা'যীরী শাস্তি হিসেবে ভীতি প্রদর্শনের বিষয়টি যৌক্তিক। আমরা অনেক সময় শিক্ষার্থীকে পড়াশুনা না করলে বা পরীক্ষায় ফেইল করলে তাকে ভীতি প্রদর্শনমূলক বিভিন্ন কথা বলে পড়াশুনায় মনোযোগ প্রদর্শনের চেষ্টা করি তেমনিভাবে সমাজে কিছু অপরাধী আছে যাদের ভয় দেখিয়ে কতিপয় অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখা সম্ভব।

এর দর্শন হলো, এর মাধ্যমে সমাজে অপরাধ প্রতিরোধ করা এবং অরপাধীকে সংশোধন করা। পুনরায় সে যেন এ ধরনের অপরাধ করতে সাহস না পায়।

১৩. চাকুরীচ্যুত্য করণ (اَلْعَزْل)

কোন দুর্নীতিবাজ বা দায়িত্ব পালনে অবহেলাকারী কর্মকর্তাকে তা'যীরী শাস্তি হিসেবে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা আইনগতভাবে বৈধ। কেননা উমর (রা)-এর নিকট খবর পৌঁছল যে, কোনো কোনো কর্মকর্তার ঘরসমূহে মদপানের প্রশংসায় কবিতার আসর চলছে। ফলে তিনি তাদেরকে চাকুরীচ্যুত করেন (Ibn Taymiyyah 2004, 58; 'Awdah ND, 704)।

দুর্নীতিবাজ বা দায়িত্ব পালনে অবহেলাকারী কর্মকর্তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা যৌক্তিক। খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মের ধারাবাহিকতা বর্তমান যুগেও দেখা যায়। সারাবিশ্বে দুর্নীতিবাজদের তথা বড় বড় অন্যায়ের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের ঘৃণার চোখে দেখা হয় এবং তাদের বরখাস্তের মাধ্যমে সৎ, যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়া হয়।

চাকুরীচুত্য করার দর্শন হলো, দুর্নীতিবাজ তথা অন্যায়ের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করে সৎ, যোগ্য, নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা নিয়োগের মাধ্যমে অপরাধমুক্ত বলিষ্ঠ সমাজ গঠন করা সম্ভব।

১৪. অধিকার বঞ্চিতকরণ (اَلْحِرْمَان)

অপরাধী ব্যক্তিকে চাকুরী, অন্যান্য পাওনা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তা'যীরের শাস্তি দেয়া যেতে পারে। তবে শর্ত এই যে, বিচারক যদি মনে করেন, তার সংশোধনের জন্য এটাই যথেষ্ট। যেমন- সাক্ষ্য দেয়া থেকে ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা থেকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। যুদ্ধে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা। অবাধ্য স্ত্রীর ভরণপোষণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, রাষ্ট্র কিংবা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত করা, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিদেশে ডেপুটেশন হিসেবে প্রেরণ করা ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রেরিত হওয়া থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদির মাধ্যমে তা'যীর হতে পারে।

১৫. সম্পদ বাজেয়াপ্ত করণ (اَلْمَصَادِرَة)

তা'যীর হিসেবে অপরাধীর অর্থ-সম্পদ একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আটক করে রাখা যেতে পারে, যাতে সে পরিণাম বিবেচনা করে সংশোধন হতে পারে। অপরাধী সংশোধন হয়ে গেলে তার সম্পদ তাকে ফেরত দিতে হবে। সরকার তা রাজকোষে যোগ করতে পারবে না। কারণ কারো সম্পদ তার সম্মতি কিংবা আইনসম্মত পথ ব্যতীত অন্য কোনোভাবে ভোগ করা কারো জন্য বৈধ নয়। তবে অপরাধীর সংশোধন হবার ব্যাপারে বিচারিক বা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ নিরাশ হলে তার আটককৃত মাল জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যাবে (Ibn Nujaym ND, 5/42)।

অপরাধী পাপিষ্ঠ ব্যক্তির সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে কখন কখনও দণ্ডবিধি কার্যকর করা হয়। তা দুপ্রকার।

ক. নির্দ্ধারিত দণ্ডবিধি

ইসলামী আইনবিদ ফকীহগণ নির্দ্ধারিত শ্রেণির বিধানে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। তাহলো ক্ষতিপূরণ। আর এটি আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার সম্পর্কীয় ব্যাপারে হোক। যেমন হজ্জের ইহরামকারী মুহরিম ব্যক্তি স্থলভাগের শিকার করা। আল্লাহ তা'আলা শিকারের জরিমানাজনিত শাস্তি সম্পর্কে অবহিত করে বলেন, لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ "তাহলে সে তার কর্মের ফল ভোগ করতে পারবে (Al-Qurān, 5:95)।" অথবা মানবাধিকার সম্পর্কীয় ব্যাপার হোক, তথা তার সম্পদ বিনষ্ট করা। এ শ্রেণির অপরাধীর শাস্তি তার ইচ্ছার বিপরীতে হয়ে থাকে। সুতরাং হত্যাকারী উত্তরাধিকারী মিরাছ থেকে বঞ্চিত থাকবে। অনুরূপভাবে চুক্তিবদ্ধ গোলাম যখন তার মালিককে হত্যা করে ফেলে, তখন তার চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে যখন ওসিয়াতকারীকে ওসিয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহলে তার ওসিয়াত বাতিল বলে গণ্য। অনুরূপভাবে বিবাদকারী মহিলার ভরণপোষণের দায়িত্ব থেকে তার স্বামীকে অব্যাহতি দেয়া হবে, যে স্বামীর উপর দায়িত্ব ছিল।

২. অনির্দ্ধারিত দণ্ডবিধি

অনির্দ্ধারিত শ্রেণির সম্পদ বাজেয়াপ্ত সম্পর্কে ইসলামী আইনবিদগণের তিনটি অভিমত রয়েছে।

ক. ইমাম আবূ ইউসূফ (র) বলেন, "শাসকের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তা'যীরী শাস্তি প্রদানের বৈধ অধিকার রয়েছে।"

খ. কোনো কোনো আইনবিদের মতে, "সাধারণভাবে সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তা'যীরী শাস্তি প্রদান বৈধ নয়। কেননা এ সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহ্র কোনো ভাষ্য অবধারিত নেই। যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেও থাকেন, তাও রহিত হয়ে গেছে (Ibn Qayyim 1991, 2/117; Ibn Taimiyyah 2004, 49)।

গ. কোনো কোনো ইসলামী আইনবিদের মতে, "বিশেষ কতিপয় ক্ষেত্রে এ ধরনের শাস্তি বৈধ আছে, তবে সাধারণভাবে তা বৈধ নয়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীগণের (রা) পক্ষ থেকে স্পষ্ট ভাষ্য রয়েছে। যেমন দুধে পানি মিশ্রিত করে ভেজাল দিলে তা মাটিতে ফেলে দেয়া। শিল্পকার্যে জালিয়াতি করলে তাকে বিনষ্ট করে দেয়া। যেমন খারাপ সূতা দিয়ে কাপড় বুনলে তাকে ছিঁড়ে ফেলে ও আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া বৈধ। অনুরূপভাবে জালিয়াতকৃত রুটি তৈরি, তরমুজ, খরমুজ ও কাপড় জাতীয় বিষয়ে জালিয়াতি করা। এতদভিন্ন তা ফকীরদের মধ্যে সাদাকাও করে দিতে পারবে। অনুরূপভাবে জালমুদ্রা স্বর্ণমুদ্রা হোক কিংবা রৌপ্যমুদ্রা হোক তা কোনো মুসলমান করলে তাদের মুদ্রা ভেঙ্গে দেয়া। অনুরূপভাবে অবৈধ ছবি প্রতিকৃতি বিনষ্ট করা, মুসলমানের মদের পাত্র থেকে মদ ঢেলে দেয়া। গানের বা বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া, ছবি পরিবর্তন করে দেয়া, চুরিকৃত উটের রশি নকীল নিয়ে নেয়া। এভাবে আরো যত জালিয়াতির দিক রয়েছে তার হুকুম একই। এতে বিচারকের পূর্ণ ইখ্তিয়ার রয়েছে যে, কম-বেশি করা, বাজেয়াপ্ত করার মাধ্যমে। এটা জনসাধারণের স্বার্থে করতে হবে। যে সকল আইনবিদ রহিত হওয়ার দাবী করেছেন- তা বাতিল বলে গণ্য হবে (Ibn Taimiyyah 2004, 49-56, Kamal 2006, 120-122)।

১৬. অপসারণ (اَلإِزَالَة)

অপরাধের উৎসমূল অপসারণ এবং হারাম কার্য নিষিদ্ধ করে তা'যীর করা যেতে পারে। যেমন: মদ ও মদের আসর এবং আড্ডাখানা নিষিদ্ধকরণ, জুয়ার আসর নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি ('Awdah ND, 704-705)

কখনও কখনও তা'যীরী শাস্তির ক্ষেত্রে দূরে রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যেমন কোনো ব্যক্তি হারাম কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। আর যদি এ কাজের ফলাফল প্রতিষ্ঠিত হয়, অথবা প্রকাশ্য বস্তুগুলোর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়, অতএব অবশিষ্ট এ প্রভাব দূর করা সম্ভব হবে।

আর যদি ঐ বস্তু প্রকৃতপক্ষে মুবাহ হয় যেমন কোনো ব্যক্তি সর্বসাধারণের যাতায়াতের পথে গৃহ নির্মাণ করে কিংবা অপরের মালিকানার স্থানে সম্মতি ছাড়া গৃহ নির্মাণ করে, এ ঘরে ভেঙ্গে দিয়ে ক্ষতি দূরীকরণ করা সম্ভব হয় এবং তার মূল্য

বিনিময় ছাড়া অপসারণ করা সম্ভব হয়, অনুরূপভাবে মদের পাত্রসমূহ ভেঙ্গে দিয়েও সম্ভব হয়। কারো কারো নিকট ভেজাল দুধ ফেলে দেয়া হয়। অনুরূপভাবে ঐ সকল হাতিয়ারসমূহ যেগুলো জুয়া খেলায় ব্যবহার করা হয়- নষ্ট করে দিয়ে সমস্যা দূর করা যায় ইত্যাদি (Kamal 2006, 120)।

অপরাধের উৎসমূল নির্মূল করার মাধ্যমে সমাজ থেকে অপরাধ দূরীভূত করা সম্ভব। বর্তমান সরকারের ক্যাসিনো (জুয়া) অভিযানে ক্যাসিনোর আসর সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধকরণ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধের সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের দমন করা একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে প্রশাসন তদন্ত চালিয়ে মাদকের আসর, মদপানকারী, অবৈধ অস্ত্র পাচারকারী, গাজার গাছ চাষকারীদের আটক করে বিভিন্নভাবে শাস্তির ব্যবস্থা করছে। আর এর মাধ্যমে সমাজে কিছুটা হলেও অপরাধ হ্রাস পাচ্ছে।

১৭. বদলি করা (Transfer)

অপরাধী চাকুরীজীবী হলে এবং বিচারক যদি মনে করেন স্থানান্তর তার সংশোধনের জন্য যথেষ্ট, তাহলে তিনি তার জন্য ট্রান্সফারের রায় দিতে পারেন।

তা'যীরী শাস্তির যৌক্তিকতা ও দর্শন

মানুষের মৌলিক বিষয় যেমন- দীন, বংশ, বিবেক-বুদ্ধি, ধন-সম্পদ ও ইয্যত-আব্রু ইত্যাদি সংরক্ষণ। অনুরূপভাবে সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন এবং অপরাধীকে পবিত্রকরণের লক্ষ্যে তা'যীরী শাস্তি প্রদান যৌক্তিক। বাহ্যত এতে যদিও অপরাধীকে কষ্ট দান করা হয়; কিন্তু এ শাস্তি প্রদানের লক্ষ্য শুধু অপরাধীকে কষ্ট দান করা নয় বরং অন্যায় ও যুলমের বিস্তার ও ব্যাপকতা প্রতিরোধ এবং আইন অমান্য করার প্রবণতা রুদ্ধকরণ। বস্তুত এ শাস্তি হচ্ছে রোগ প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক ঔষধ স্বরূপ। জীবন রক্ষার জন্য যেমন নষ্ট হয়ে যাওয়া অঙ্গ কেটে ফেলা অপরিহার্য হয়ে পড়ে তেমনি সমাজের মানুষকে রক্ষার জন্য অপরাধীদের কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়াও ঠিক তেমনি। আর এ শাস্তি স্থান, কাল, পাত্রভেদে এবং বিচারকের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। অপরাধীর গুরুতর কোন অপরাধের জন্য যেমন রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান লঙ্ঘন, মানুষের শান্তি-শৃঙখলা হরণ এবং মারাত্মক কোনো অপরাধ বারংবার সংঘটিত করলে তাকে হত্যা, শূলে চড়ানোসহ বেত্রাঘাত, বন্দি, দেশান্তর, আর্থিক দণ্ড, বয়কট করার শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। আর লঘু অপরাধের জন্য তিরস্কার, ভর্ৎসনা, উপদেশ, অপরাধের উৎস অপসারণ, সম্পত্তির মালিকানা নিষিদ্ধকরণ, চাকুরীচ্যুতকরণ, আদালতে তলব, অপরাধীর নাম ঢোল-শুহরত বা টিভি, পত্র-পত্রিকায় জনগণের মাঝে প্রচার করা প্রভৃতি শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে। আর এসব শাস্তি (জনসম্মুখে) প্রদানের মাধ্যমে সাধারণ জনগণ এবং অপরাধী অপরাধের ভয়াবহতা দেখে উপলব্ধি করে ঐ ধরনের অপরাধ কর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকবে। ফলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পাবে। সমাজের প্রতিটি স্তরে অপরাধ প্রবণতা দূরীভূত করণের এটাই সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ।

ইসলামের দৃষ্টিতে তা'যীরী অপরাধের যে শাস্তি প্রদান করা হয়, তা মূলত অপরাধীকে পরিশুদ্ধ করে, তার পাপ ধুয়ে-মুছে ফেলে এবং তাকে পরকালীন আযাব থেকে রক্ষা করে। এ কারণে অপরাধী শাস্তি ভোগ করার পরও নিজের মধ্যে তৃপ্তি ও প্রশান্তি অনুভব করে। সমাজের প্রতি তার মনে কোনোরূপ আক্রোশ জাগে না। কেননা সে জানতে পারে যে, এ শাস্তি কারো মনগড়া নয়; তা আল্লাহরই প্রদত্ত। মানব রচিত আইন এবং আল্লাহ কর্তৃক রচিত আইনে এটাই বড় পার্থক্য। মানব রচিত আইনে দণ্ডিত ব্যক্তির মনে সমাজের সমষ্টির প্রতি প্রতিহিংসা জাগ্রত হয়। আর আল্লাহ কর্তৃক রচিত আইনে দণ্ডিত ব্যক্তির মনে আত্ম-উপলব্ধির সঞ্চার হয়।

তা'যীরী শাস্তির দর্শন হলো অপরাধী পাপীদেরকে এবং আইন শৃঙ্খলা অমান্যকারীদেরকে আচরণ শিক্ষা দেয়া। তাতে লক্ষ্য রাখা হয়- উচুঁ মর্যাদাবান ব্যক্তির পদস্খলনের ব্যাপারে, আরো লক্ষ্য রাখা হয়- নিম্ন শ্রেণির মর্যাদার দিকেও। এখানে অপরাধ সম্পর্কে জানা ও অজানার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। ছোট অপরাধ ও বড় অপরাধের বিষয়টিও বিবেচনায় আনা হয়ে থাকে। স্বেচ্ছায় অপরাধকারী, অনিচ্ছায় অপরাধরারীর ব্যাপারও বিবেচনায় আনা হয়। আর এটিই উপযুক্ত সংশোধনের দাবীদার।

তা'যীরী শাস্তির ব্যাপারে বিচারকের নিকট মোকদ্দমা উঠলে সুপারিশ করা বৈধ, যাতে লঘুদণ্ড দেয়া হয়। যে ব্যক্তি জেনেশুনে অপরাধ করে এবং বারবার করে, তাকে রাষ্ট্রপ্রধান যেরূপ ভাল মনে করেন ঐরূপ শাস্তি দিতে পারেন। হুদূদ বিধিবদ্ধ দণ্ড ও কিসাসের কার্যকর করার অধিকার রাষ্ট্রপ্রধান, বিচারক ও শাসকবৃন্দের রয়েছে। তেমনিভাবে দণ্ডবিধিসমূহ-তা'যীরাতের এ অধিকার পিতাসহ ইমাম, কাযী ও শাসকদেরও করেছে। কেননা পিতার জন্য তা'লীম দেয়ার উদ্দেশ্যে তা'যীরী শাস্তি দেয়ার ও অন্যায় কর্মগুলো থেকে ধমক দেয়ার অধিকার রয়েছে। তেমনিভাবে মায়েরও শিক্ষা দান ও সালাতের নির্দেশ দেয়ার অধিকার রয়েছে। সালাত না পড়লে তাকে মারধর করার অধিকার রয়েছে। অনুরূপভাবে দাস-দাসীর মালিকের অধিকার রয়েছে দাসীকে তা'যীরী শাস্তি দেয়ার, আরো অধিকার রয়েছে আল্লাহ তা'আলার হক আদায়ের ব্যাপারেও। বিশুদ্ধ মতে, যেমন স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ হলে তাকে তা'যীরী শাস্তি প্রদানের অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে সালাত পরিত্যাগ করলে তাকে কথাবার্তায় ধমক দেয়ার অধিকারও রয়েছে। অনুরূপভাবে শিক্ষকের জন্য ছোট শিক্ষার্থীদের আদব প্রদানের লক্ষে তা'যীরী শাস্তি প্রদানের অধিকার রয়েছে।

উপসংহার

অপরাধ মানব সভ্যতার জন্য হুমকি স্বরূপ এবং সমাজের শান্তি শৃঙ্খলার পথে বড় অন্তরায়। অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে মানব জীবন অশান্তি ও অকল্যাণে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অপরাধ ও অপরাধ প্রবণতা থেকে মানুষকে বিরত রাখার লক্ষ্যেই ন্যায় বিচারের মাধ্যমে শাস্তির বিধান কার্যকর করা হয়েছে। ইসলামী শাস্তি বিধানের মধ্যে তা'যীর তথা সাধারণ শাস্তি একটি অন্যতম অপরাধ প্রতিরোধক বিধান। তা'যীর

পর্যায়ের শাস্তিসমূহের ক্ষেত্র বিশাল। এটি হদ্দ বা কিসাসের ন্যায় নির্দিষ্ট কোন একক শাস্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। এক্ষেত্রে বিচারক আসামীকে স্থান, কাল, পাত্র ও প্রেক্ষাপট ভেদে যে কোন ধরনের শাস্তি দিতে পারেন। অবশ্য তা কৃত অপরাধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। আর এ শাস্তির উদ্দেশ্যই হবে সামষ্টিক কল্যাণ, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা, সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা কায়েম করা এবং সর্বপ্রকার যুল্‌ম ও সামাজিক অনাচার প্রতিহত করা। সুতরাং অপরাধ প্রতিরোধে তা'যীরী বা সাধারণ শাস্তির গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা, মানুষের মৌলিক বিষয় তথা জান-মাল, ইয্‌যত, দীন, বংশ ও বিবেকবুদ্ধি সংরক্ষণ সুনিশ্চিত হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, তা'যীরের উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া, সংশোধন করা এবং সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে অনুপ্রাণিত করা হলেও তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা ও ধ্বংস করা কোনোভাবেই এর উদ্দেশ্য নয়। এ কারণে সাধারণত এমন কোন শাস্তি প্রদান করা জায়িয নেই, যাতে ব্যক্তির প্রাণ নাশ কিংবা কোন অঙ্গ হানির কোনরূপ আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। এমনকি যেসব শাস্তি ভবিষ্যতে ব্যক্তির সুস্থ ও পবিত্র জীবন যাপনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, সেরূপ শাস্তি দেয়াও জায়িয নয়। যেমন, অপরাধীর নাক, কান, আঙ্গুলের মাথা কর্তন, হাড় ভেঙ্গে দেওয়া বা শরীরের অন্য কোন অঙ্গ-প্রতঙ্গ কেটে বা ভেঙ্গে দিয়ে শাস্তি দেয়া বৈধ নয়। চেহারা কিংবা নাজুক কোন স্থান যেমন গুপ্তাঙ্গ, পেট ও বুক প্রভৃতি স্থানে প্রহার করা বৈধ নয়। তা'যীরী শাস্তি হিসেবে আগুন জ্বালিয়ে বা পানিতে ডুবিয়ে শাস্তি দেওয়া জায়িয নয়। কাউকে ক্ষুধা ও পিপাসায় এবং ঠাণ্ডা ও গরমে কষ্ট দেয়া বৈধ নয়। বিবস্ত্র করে শাস্তি দেওয়াও হারাম। কাউকে হেয় ও অপমানকর শাস্তি দেওয়া এবং ওযূ-সালাত আদায় করতে এবং হাজত পূরণ করতে বাধা দেওয়া জায়িয নয়। গলা টিপে ধরা, চাপেটাঘাত করাও বৈধ নয়। এমনকি কারো প্রতি হিংস্র প্রাণী কিংবা সাপ বিচ্ছুকে লেলিয়ে দেওয়াও জায়িয নয়। কারণ এসবের দ্বারা ব্যক্তিকে শুধু অপমান করা হয়ে থাকে। এতে সংশোধন ও শিক্ষাদানের বিষয়টি উপেক্ষিত।

Bibliography

Al-Qurān Al-Karīm.

Abū Dā'ūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath ibn Isḥāq al-Azdī al-Sijistānī. ND. *Sunan*. Bairut: Al-Maktaba al-Asriyyah.

Al-Balyāwī, Abul Faİal ʿAbdul ×afeez . 1982. *MisbaÍ al-Lughat*. Delhi: Taj Offset Press.

Al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn Ḥusayn Ibn 'Alī ibn Mūsā al-Khosrojerdī. 2003. *Al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Al-Bukhārī, Abū ʿAbdullah Muḥammd ibn Ismāʿīl. 1987. *Al-Jāmiʿ al-Musnad al-Sahīh*. Cairo: Dār Ibn Kathīr.

Al-Fatāwā Al-Hindyia, Allama al-Humam Shaykh Nizam & group of Indian Hanafi scholars. 2000. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿ Ilmiyyah.

Ali, Dr. Ahmad. 2009. *Islamar Sasti Aien*. Dhaka: Bangladesh Islamic Center.

Al-Jazīrī, ʿAbd al-Rahmān. 2005. *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Cairo: Dār al-Afāq.

Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. 1427H. Kuwait: Ministry of Awqaf and Islamic Affairs.

Al-Māwardī, Abul Hasan ‘Alī ibn Muhammad Habīb. 1427H. *al-Ahkām al- Sultāniyyah*. commentary of Ahmad Zād. Cairo: Dār al-Hadīth.

Al-Mutlaq, Dr. Abdullah Ibn Muhammad and Al-Arfaz, Khalid Ibn Ali. "Aqsaru Ma Qila Fit-Ta'ziri Bil Jaldi Was Sijni Wa Radayilis Sijni". *Mazallah al-Buhus al-Islamiya*. Ukhra, 1424H. Issue: 69, Page: 173-209

Al-Nasayī, Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad Inb Shu‘aib Ibn ‘Alī. 1420H. *Sunan*. Amman: Bait al-Afkār al-Dawliyah.

Al-Ramlī, Muḥammad ibn Aḥmad. ND. *Nihāyatul Muhtāj ilā Syarhil Minhāj*. Egypt: Mustafa al-Babi al-Halabi.

Al-Sābiq, Sayyid. 1988. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī.

Al-San'anī, Abd al-Razzāq ibn Hammām ibn Nāfi'. 1403H. *Musannaf*. Bairut: Al-Maktab al-Islāmi.

Al-Sarakhsī, Shamsuddin. 1989. *Kitāb al-Mabsūt*. Beirut: Dār al-M‘arifah.

Al-Tirmīdhī, Abū ʿĪsā Muḥammad ibn ʿĪsā as-Sulamī aḍ-Ḍarīr al-Būghī al-Tirmidhī. 1985. *Sunan*. Egypt: Mustafa al-Babi al-Halabi.

Amīr, Dr. Abdul Azīz. 2006. Al-Ta'azīr fī al-Sharī'at al-Islāmiyyah. Cairo: Dār al-Fikr Al-Arabī.

‘Awdah, Dr. ‘Abd al-Qādir. ND. *Al-Tashri' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bil Qānūn al-Wadh'ie'*. Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī.

Fatawa and Masail (V-5). 2001. Dhaka: Islamic Foundation.

Galwash, Dr. Ahmed A. 1963. *The Religion of Islam*, Cairo: Imprimeria Misr,

Hughes, Thomas Patrick. 1976. *A Dictionary of Islam*. New Delhi: Oriental books Reprint Corporation.

Ibn ʿĀbidīn, Muḥammad Amin Ibn ʿUmar Ibn ʿAbd al-ʿAzīz al-Ḥanafī. 2003. *Radd al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār*. Riyadh: Dār al-ʿĀlam Al-Kutub.

Ibn Farḥūn, Burhān al-Dīn al-Ya'marī al-Andalusī al-Mālikī. 1986. *Kitāb Tabṣirat al-Ḥukkām fī Uṣūl al-Aqḍiyah, wa-Manāhij al-Aḥkām*. Cairo: Maktaba al-Kulliyat al-Azhariya.

Ibn Ḥajar al-Asqalānī, Abū al-Fadl Aḥmad ibn Alī ibn Ḥaja. 1379H. *Fatḥ al-Bārī Sharḥ Saḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dīr al-Marifa

Ibn Humām, Kamāl al-Dīn Muḥammad ibn ‘Abd al-Wāḥid ibn ‘Abd al-Hamīd. ND. *Fath al-Qadīr.* Kuwait: Al-Maktaba al-Habībiyyah.

Ibn Jarīr al-Tabarī, Abū Jaʿ far Muḥammad. 1997. *Jamiʿ al-Bayān ʿ an Taʿ wil ay al-Qurān*. Damascus: Dār al-Qalam.

Ibn Mājah, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah al-Rab‘ī al-Qazwīnī Ibn Mājah. ND. *Sunan.* Cairo: Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah.

Ibn Manẓūr, Muhammad ibn Mukarram ibn Alī ibn Ahmad ibn Manzūr al-Ansārī. 2000. *Lisān al-ʿArab*. Beirut: Dār Sādir.

Ibn Nujaym, Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm Ibn Nujaym. ND. Al-Baḥr al-Rā’iq Sharḥ Kanz al-Daqā’iq. Cairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī.

Ibn Nujaym, Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm Ibn Nujaym. ND. *Al-Baḥr al-Rā’iq Sharḥ Kanz al-Daqā’iq*. Cairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī.

Ibn Qayyim al-Jawjiyyah, Abū ʿ Abdullah Muhammad ibn Abū Bakr. 1991. ʿ *Ilām al-Muwaqiyīn* ʿ *an Rabb al-Alamīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿ Ilmiyyah.

Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad. 1997. *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Taimiyyah, Ahmad ibn ‘Abd al-Halīm. 2001. *Al-Siāsah al-Shar‘iyyah fī Islāh al-Rā‘ē wa al-Ra‘ēyyah*. Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī.

Ibn Taymiyyah, Ahmad ibn ʿ Abd al-Halīm. 2004. *Al-Hisbah fī al-Islām*. Beirut: Dār Ibn Hazm.

Kamal, Dr. Muhammad Mostafa. 2006. *Moulik Samasha Samadhanay Islami Ain*. Dhaka: Islamic Foundation.

Mālik ibn Anas ibn Mālik al-Aṣbaḥī.1985. *Al-Muwatta*. Egypt: Dār Ihyā al-Turāth al-Arabī.

Misbah, Abu Taher. 1999. *Al-Manar*. Dhaka: Mohammadi Library.

Muslim, Abū al-Hussain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qushayrī. 2003. *Al-Musnad Al-Sahih*. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Rahim, Muhammad Abdur. 2006. *Islam in Crime Prevention*. Dhaka: Islamic Foundation.

Rahman, Gazi Shamsur. 1992. *The Rules of Islam*. Dhaka: Islamic Foundation.

Saeed Ibn Abdullah. 1422H. *Al-Hisbah Was Siyasatul Jinaiyah Fi Mamlaqatil Arabiyah As-Saudiyah*. Riyadh: Maktabatur Rashid,.

Shaltut, Sheikh Mahmud. 1966. *Al-Islām, ‘Akīda wa-Sharī'a*. Beirut: Dār al-Qalam.

Siddiqi, Muhammad Iqbal. 1991. The Penal law of Islam. New Delhi: International Islamic Publishers.